জাতীয় নির্বাচনে ইভিএমের উপযোগিতা

কারিগরি দিক পর্যালোচনা ও নির্বাচনে এর প্রভাব

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সূচি

ইভিএম: হার্ডওয়ার এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 3

ইভিএম: চ্যালেঞ্জ, অভিযোগ এবং সমস্যা 3

এক. নিখুঁত এনআইডি এবং বায়োমেট্রিক তথ্যশালাই এখনও তৈরি হয়নি! 3

দুই. মেশিন বায়োমেট্রিক সঠিকভাবে নেয় না! 3

তিন. একটি কেন্দ্রের সব বুথের মাস্টার ডেটাবেজ নেই! 4

চার. কর্মকর্তাদের ইভিএমকে ওভাররাইড করার ক্ষমতা দেওয়া! 4

পাঁচ. ইন্টারনেট সংযুক্ত না থাকলেও ইভিএমকে দূর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব কি? 4

ছয়. ইভিএমে ভোটার ভেরিফাইড পেপার অডিট ট্রেইল নেই! 5

সাত. ডিজিটাল অডিট ট্রেইলের ব্যবস্থা নিরাপদ নয় 5

আট. ইভিএম হ্যাং করে 6

নয়. ইন্টিগ্রেটেড রেজাল্ট তৈরির সুযোগ নেই, ভোটদান ডিজিটাল কিন্তু ফলাফল তৈরি ম্যানুয়াল কেন? 6

ইভিএমের মাধ্যমে নির্বাচন: কমিশনের সক্ষমতা কতটুকু? 6

অর্থনৈতিক সংকটকালে ইভিএমের অতি উচ্চ খরচ যৌক্তিক কি? 7

ইভিএমে মানুষের আস্থা আছে কি? 7

রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য ছাড়াই আগামী জাতীয় নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। গত ২৩ আগস্ট সর্বোচ্চ ১৫০টি আসনে (ইভিএম) ভোট নেওয়ার কথা জানায় নির্বাচন কমিশন। যদিও কমিশনের সংলাপে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল ইভিএম নিয়ে সংশয় ও সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল নিজেও একটি সংলাপে বলেছিলেন, **'অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ইভিএমে বিশ্বাস করছে না'** (*সময়ের আলো,* ২১ জুলাই ২০২২)। কিন্তু এই অবিশ্বাসকে শেষ পর্যন্ত আমলে নেয়নি ইসি।

২০১৪ নির্বাচনে ভোটের আগেই সরকার গঠনের উপযোগী আসনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সরকার পাশ করেছিল। ২০১৮ সালের ভোটের আগের রাতেই 'আয়োজনের' মাধ্যমে ভোটবক্স ভর্তি করা হয়েছে বলেই শক্ত অভিযোগ রয়েছে। চারদিকে বলাবলি হচ্ছে, এবার সেসব দৃষ্টিকটু পথের ওপর নির্ভরতা কমানোর দৃশ্যমান একটা চেষ্টা আছে। ফলে সরকারের ভরসার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে ইভিএম, যা দিয়ে অদৃশ্যভাবে কারচুপি করে জেতা যায়।

বিরোধী রাজনীতিতে বহুল আলোচিত বিষয় হচ্ছে, ২০২৩ সালের রাজনৈতিক সংকটকে সরকার কি কারিগরি পদ্ধতিতে মোকাবিলা করতে যাচ্ছে? ডিজিটাল সরকারের শেষ রক্ষাকবচ কি ডিজিটাল যন্ত্রই হতে যাচ্ছে! দেশের এলিট ফোর্সে শীর্ষ সদস্যদের ওপর দু'ধরনের মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং ঢাকার মার্কিন দুতাবাসের অতি নজরদারির মুখে রাজনৈতিক সংকটের যৌক্তিক সমাধানে না গিয়ে কারিগরি কৌশলে সংকট পাশ কাটানোর পরিকল্পনা কতটা কাজে আসবে? যেখানে ভোটদান কক্ষে সরকার দলীয় কেউ দাঁড়িয়ে থেকে পছন্দের বোতামটি টিপে দেন বা দিতে বাধ্য করেন, সেখানে সরকার সত্যি সত্যিই কি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সব পক্ষকেই ধোঁকা দিতে সক্ষম হবে?

৩০ মে তারিখে নির্বাচন কমিশনার মো. আহসান হাবিব খান বলেছেন, **'গোপন কক্ষে একজন করে 'ডাকাত' দাঁড়িয়ে থাকে, এটাই ইভিএমের চ্যালেঞ্জ'**(*প্রথম আলো,* ৩০ মে ২০২২)। এমতাবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের কারিগরি উৎকর্ষতাও স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভোটের নিশ্চয়তা দেয় না। ভোটার শনাক্তকরণের পরে যেখানে ডাকাতরা 'বাটন'টি টিপে দেন, সেখানে প্রযুক্তিনির্ভর ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএমও একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। বিষয়টি শুধুই কারিগরি অক্ষমতার নয়, বরং বিষয়টি রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চার।

সরকার ইভিএম নিয়ে পুলকিত হলেও শুধু বিরোধী মহলে নয় বরং বিশেষজ্ঞমহলেও যন্ত্রটি নিয়ে জোরালো আপত্তি রয়েছে। অভিযোগ আছে, ইভিএম রিমোট কন্ট্রোল বা দুর নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ড. অ্যালেক্স হালডারমেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে ইভিএমের ওপর গবেষণা করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, আমেরিকায় ইভিএম টেম্পারপ্রুফ নয়, ফলে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে ইভিএম ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ২২টির বেশি অঙ্গরাজ্যে ইভিএম নিষিদ্ধ। আয়ারল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসও ইভিএম ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। জার্মানি ও ফিনল্যান্ডে আদালতের নির্দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ইভিএম। ভারতের নির্বাচনেও ইভিএম ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, ভারতে ইভিএম জালিয়াতি জেনে যাবার কারণে খুনের অভিযোগ এসেছে ('ইভিএমের কারচুপি জানায় গোপীনাথ ও গৌরী খুন?' (*প্রথম আলো,* ২৪ জানুয়ারি ২০১৯)। ২০০৬ সালে আয়ারল্যান্ড ই-ভোটিং পরিত্যাগ করেছে। ২০০৯ সালের মার্চ মাসে জার্মানির ফেডারেল ভোট ইভিএমকে অসাংবিধানিক ঘোষণা দেয়। ২০০৯ সালে ফিনল্যান্ডের সুপ্রিম কোর্ট তিনটি মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের ফলাফল অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করে।

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিসট্যান্সের পরিসংখ্যান অনুসারে, বিশ্বের ১৭৮টি দেশের মধ্যে যেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, বর্তমানে মাত্র ২৮টি দেশের জাতীয় নির্বাচনে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে, ১৩টি দেশে সম্পূর্ণরূপে ই-ভোটিং ব্যবহার করা হচ্ছে।

মূলত, ইভিএম নিয়ে বিতর্ক ও নানাবিধ জটিলতার কারণে উন্নত দেশগুলো ইভিএম ব্যবহার থেকে সরে গেছে। ইভিএম নিয়ে পশ্চিমা পর্যবেক্ষণে বলা হচ্ছে, মূলত বলপ্রয়োগে পরিচালিত সরকারগুলোতে ইভিএম চাপিয়ে দেয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ রয়েছে।

ভোট গ্রহণ পদ্ধতির সংস্কার নিয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকায় বহু কাজ হয়েছে। সেখানে ইভিএম পদ্ধতিতে না যাওয়া হলেও ভোটার নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে। সংস্কারের দর্শনটাই হচ্ছে নিখুঁত ভোটার শনাক্তকরণ নিশ্চিত করা। অর্থাৎ একজনের ভোট যাতে আরেকজন দিতে না পারে এবং জানতে না পারে। তারা জোর দিয়েছে দুই স্তরের শনাক্তকরণে। ডাকযোগে ঠিকানায় পাঠানো কিউআর কোড সংবলিত তথ্য ব্যাংক বা টিকেট এবং ভোটকেন্দ্রে সশরীরে করা জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই সাপেক্ষে ব্যালট পেপার ইস্যু করা হয় সেখানে। অনলাইন ভোটিংও আছে বহুস্তর নিরাপত্তা সুরক্ষা। বিপরীতে বাংলাদেশে ভোটকেন্দ্র দখল ভোট জালিয়াতির প্রধানতম হাতিয়ার। এক স্তরের শনাক্তকরণের পরে 'বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত' দলীয় লোকেরাই বাটন টিপে ভোট দেয়ার গুরুদায়িত্বটি নিয়ে নেয়। অভিযোগ আছে, মাঠ নিয়ন্ত্রণকারীরা ভোটের আগে বিরোধী এজেন্টদের বাড়ি গিয়ে ভয় দেখিয়ে আসে, ফলে তাদের পক্ষে ভোটের দিন কেন্দ্রে আসাই অনিরাপদ হয়ে পড়ে।

ইভিএম: হার্ডওয়ার এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

ইভিএম মেশিনগুলোর তিনটা অংশ থাকে। প্রথমত, কন্ট্রোল ইউনিট, যাতে ভোট ও ভোটারদের তথ্য জমা থাকে, দ্বিতীয়ত ডিসপ্লে ইউনিট, সেই তথ্যগুলো প্রদর্শন করে এবং ব্যালট ইউনিট, যেটাতে সুইচ টিপে ভোটাররা গোপন কক্ষে তাদের ভোট প্রদান করে থাকেন।

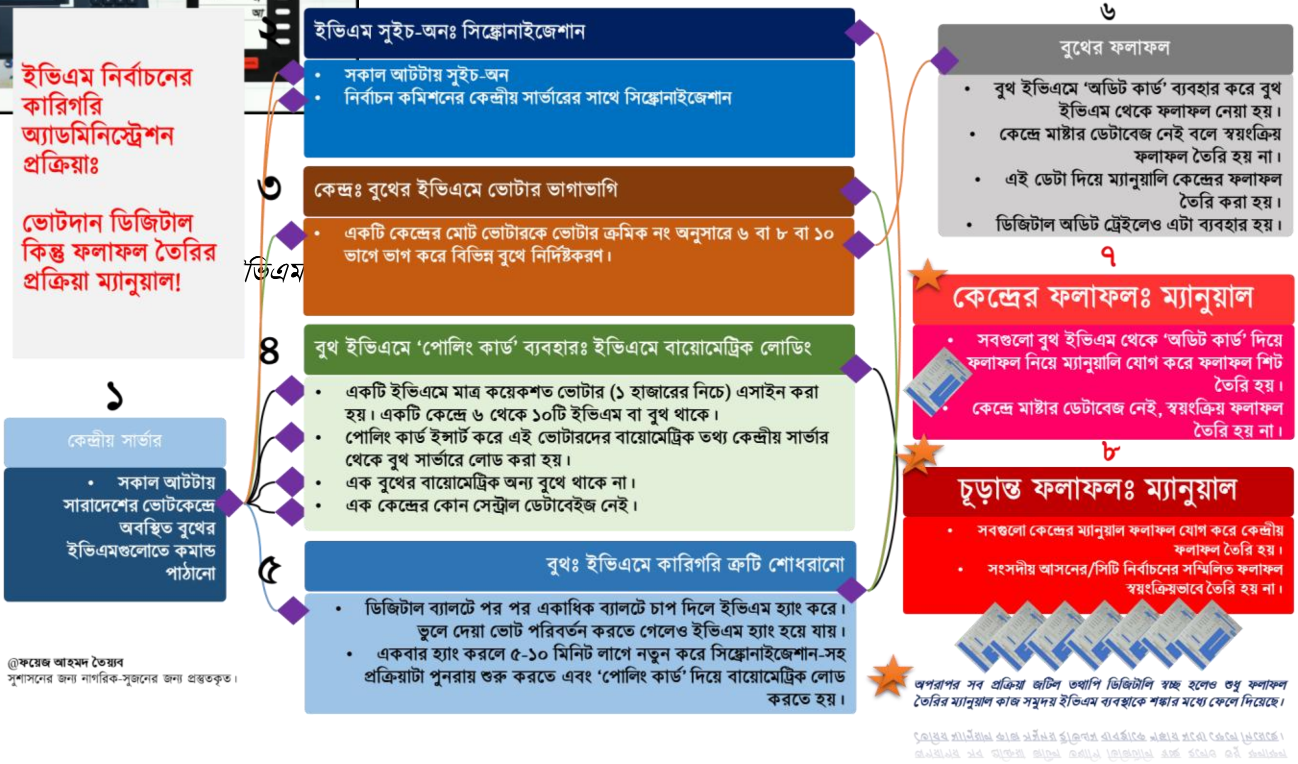

ভিএম

ইভিএম: চ্যালেঞ্জ, অভিযোগ এবং সমস্যা

এক. নিখুঁত এনআইডি এবং বায়োমেট্রিক তথ্যশালাই এখনও তৈরি হয়নি!

দেশের সব নাগরিকের নিখুঁত বায়োমেট্রিক তথ্যশালা ঠিকঠাক তৈরি হয়নি বলে নির্বাচন কমিশনে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বিষয়ক লক্ষ লক্ষ অভিযোগ আছে। এনআইডিতে ভুলের বিষয়টি স্বীকার করেছেন খোদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। তিনি ১৯ জুলাই মঙ্গলবার ২০২২ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাম্যবাদী দলের সংলাপে বলেছেন, **'ভুলের পরিমাণ এত বেশি যে, আমার মনে হয় কোটি কোটি ভুল। এটা নিয়ে বিপদে পড়ছি। নামের বানানে এটা ওটা মিলছে না। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুবান্ধবের ৪০-৫০টা সংশোধন করে দিয়েছি'** (*আমাদের সময়,* ১৯ জুলাই ২০২২)।

নতুন সমস্যা হচ্ছে, প্রায় কোটি নাগরিকের জন্মনিবন্ধনের তথ্য হারিয়ে যাওয়া। 'ধারণা করা হচ্ছে, সব মিলিয়ে কমপক্ষে ৫ কোটি জন্মনিবন্ধন একেবারেই গায়েব হয়ে গেছে। ৪ ফেব্রুয়ারি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের দায়িত্বে থাকা রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা বিষয়টি জানিয়েছেন' (*জনকণ্ঠ,* ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২)।

২০২৩ সালের মধ্যে কোটি নাগরিকের জন্মনিবন্ধন ও এনআইডি তৈরি-সহ, বিদ্যমান এনআইডির কোটি ভুল শুধরানো অসম্ভব। যেখানে নিখুঁত এনআইডি এবং বায়োমেট্রিক তথ্যশালাই তৈরি হয়নি, সেখানে অর্ধেক (১৫০) আসনে ইভিএমে ভোটের যৌক্তিকতা কোথায়?

দুই. মেশিন বায়োমেট্রিক সঠিকভাবে নেয় না!

কায়িক পরিশ্রম ও গৃহস্থালি কাজের সাথে যুক্ত নাগরিক এবং বয়স্কদের আঙুলের ছাপ ইভিএম মেশিনে না মেলার বহু অভিযোগ রয়েছে। অর্থাৎ ইলেক্ট্রনিক ভোটযন্ত্রে প্রায়ই কৃষক শ্রমিক বয়স্কদের বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণ সম্ভব হয় না। এতে বুথে দীর্ঘ লাইন তৈরি হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে ভোটদানের হার কমে যায়। এ প্রসঙ্গে পত্রপত্রিকার কিছু শিরোনাম উল্লেখ করা প্রয়োজন: ১. ইভিএমে আঙুলের ছাপ মেলেনি সিইসি'র (সমকাল,

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২০); ২. ড. কামালের ফিঙ্গার প্রিন্ট মেলেনি (আমাদের সময়, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০); ৩. ইভিএম জটিলতা : ৪০ মিনিট দাড়িয়ে ভোট দিলেন তাবিথের মা (মানবকণ্ঠ, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২০); ৪. ফুলবাড়ীতে ইভিএমে ভোটগ্রহণে জটিলতা, সময় লাগছে বেশি (প্রথম আলো, ২৮ ডিসেম্বর ২০২০); ৫. ইভিএম: আঙুলের ছাপ না মেলা যখন বড় সমস্যা (বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম) জানুয়ারি ৩১, ২০২২); ৬. ইভিএমে আঙুলের ছাপ নিয়ে বিড়ম্বনায় ভোটাররা (আরটিভি অনলাইন, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮); ৭. অনেকের আঙুলের ছাপ মিলছে না, পাকায় ঘষে চেষ্টা (সময় টিভি, ২৭ জুলাই ২০২২); ৮ আঙুলের ছাপ না মেলায় ভোট দিতে পারেননি তারা (ঢাকা পোস্ট ডটকম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)।

তিন. একটি কেন্দ্রের সব বুথের মাস্টার ডেটাবেজ নেই!

একটি কেন্দ্রের ভোটারদেরকে ভোটার ক্রমিক নাম্বারের ভিত্তিতে একাধিক পোলিং বুথে ভাগ করা হয়। শুধু ঐ নির্দিস্ট ভোটারদের বায়োমেট্রিক তথ্যই একটি ইভিএমে লোড করা হয়। এটা করতে গেলে প্রতিটি ইভিমের জন্য একটি 'পোলিং কার্ড' ইন্সার্ট করা লাগে। একটি পোলিং কার্ড অন্য ইভিএমে ব্যবহার করা যায় না।

অর্থাৎ একটি কেন্দ্রের সব ভোটারের তথ্য ঐ কেন্দ্রের সব ইভিএমে থাকে না বলে, একটি ইভিএম হ্যাং করলে বা একটি ইভিএমের ভোটারের বায়োমেট্রিক শনাক্ত করা না গেলে তাঁকে অন্য ইভিএমের মাধ্যমে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করা যায় না। যদিও নির্বাচন কমিশন থেকে ইভিএমকে কাটিং এজ প্রযুক্তি বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি, ইভিএম সত্যিকার অর্থে একটা হার্ড কোডেড এবং ভোটার অবান্ধব মেশিন।

পোলিং কার্ড ও অডিট কার্ডের সাথে ভোট কেন্দ্রের সমস্ত ভোটারের তথ্য সংযোজন করা নেই বলে, ভুলে এক বুথে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটার অন্য বুথের লাইনে গিয়ে ভোট দিতে পারেন না। এমনকি কেন্দ্রভিত্তিক মাস্টার ডেটাবেজ না থাকায় যে কোনো ভোটার যে কোনো বুথে ভোট দিতে পারেন না।

আধুনিক যুগ হচ্ছে, উন্মুক্ত ভোটের যুগ। ইউরোপে একজন ভোটার তার পরিচয়পত্র শনাক্তকরণ সাপেক্ষে সারা দেশের যে কোনো ভোটকেন্দ্রে কাগজের ব্যালটে ভোট দিতে পারেন। সেখানে বাংলাদেশে এমনকি একই কেন্দ্রের নির্ধারিত ইভিএম বুথের বাইরে অন্য বুথেও ভোট দানের সক্ষমতা তৈরি হয়নি।

চার. কর্মকর্তাদের ইভিএমকে ওভাররাইড করার ক্ষমতা দেওয়া!

অনেকের আঙুলের ছাপ ইভিএম পড়তে পারে না বলে প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের ইভিএমকে ওভাররাইড করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যেটা বিপর্যয়কর। জাতীয় নির্বাচনে ৫ থেকে ১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে এই অনধিকার চর্চার সুযোগ দেয়া আছে বলে অভিযোগ আছে। বিবিসির এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিগত জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচনী কর্মকর্তাদেরকে ২৫% ক্ষেত্রে ইভিএমকে ওভাররাইড করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তার মানে ভোটারের পরিচিতি যদি কোনো নির্বাচনি কর্মকর্তা আপলোড করতে পারেন, ১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ভোটার অনুপস্থিত থাকলেও নির্বাচনি কর্মকর্তা তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন। এটা একটা ভয়াবহ বিষয়। ইভিএমের এমন দুর্বলতা আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজেই স্বীকার করেছেন।

বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ কিংবা বগুড়ার মতো অল্প কিছু নির্বাচনী এলাকা ছাড়া অধিকাংশ সংসদীয় আসনই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ এর নির্বাচনী ফলাফলের ভোট বিন্যাসে দেখা যায় প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি আসনে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে মোট ভোটের মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে। ফলে সঠিক বায়োমেট্রিক ডেটাবেজ না থাকলে (অতি সম্প্রতি কোটি কোটি নাগরিকের জন্মনিবন্ধনের তথ্যও হারিয়ে গেছে), কৃষক-সহ শ্রমঘন কাজের জড়িত শ্রমিক ও বয়স্কদের আঙুলের ছাপ না মিললে, অন্য কোনো জালিয়াতি না থাকলেও শুধু কর্মকর্তাদের ইভিএম ওভাররাইডই ফলাফল পরিবর্তনের প্রধানতম হাতিয়ার হতে পারে!

পাঁচ. ইন্টারনেটে সংযুক্ত না থাকলেও ইভিএমকে দূর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব কি?

বাংলাদেশে যে সব ইভিএম ব্যবহৃত হয় তা ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। তাই অনেকেই মনে করছেন, যন্ত্রটি ভার্চ্যুয়ালি ম্যানুপুলেট করা অসম্ভব, এই ধারণাটিও ভুল হতে পারে। ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াও একটি কম্পিউটার সিস্টেমের সফটওয়্যার হ্যাক করা যায় কিংবা দূর নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ইভিএম ইন্টারনেটে সংযুক্ত নয়, তবে ইন্ট্রা নেটে সংযুক্ত। অর্থাৎ যন্ত্রগুলো নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হতে পারে, ফলে 'বিশেষ প্রভাবশালী' গোষ্ঠী চাইলে এই প্রাইভেট নেটওয়ার্কেরই অন্য কম্পিউটার থেকে ইভিএম নিয়ন্ত্রন সম্ভব। তদুপুরি যন্ত্রটির ভেতরে আগে থেকেই ইন্সটল্ড করা সিম বা কার্ড জাতীয় আইসি (ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট) স্থাপন করে, ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই যন্ত্রটিকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যেহেতু ইতিমধ্যেই ভাগ করা ভোটারের তথ্য কেন্দ্রীয় সার্ভার থেকে বুথের নির্দিস্ট ইভিএমে আনতে পোলিং কার্ডের/অডিট কার্ডের প্রয়োজন হয়, তাই কার্ডগুলোর সঠিকতার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

অস্ট্রেলিয়ান পাবলিক সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ তথ্য প্রযুক্তিবিদ সাইফুর রহমানের মতে, **‘ইভিএমের সঙ্গে সংযোজিত যেকোনো ইনপুট পোর্টের মাধ্যমে যন্ত্রটির ভেতর ম্যালওয়্যার-মলিকুলাস কোড প্রবেশ করিয়ে ভোটের ফলাফল বিকৃতি করা কঠিন কোনো ব্যাপার নয়’** (*দ্য ডেইলি স্টার*, ২৮ মে ২০২২)।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইভিএমের অপারেটিং সফটওয়্যার সিস্টেমে ‘ওপেন সোর্স’ নয়। ফলে ঠিক কোন এলগোরিদমে ভোটের দিন ইভিএম মেশিন চলবে সেটা নির্বাচন কমিশনের ‘বিশেষ টিমের’ বাইরে কেউ জানবে না। নির্বাচন কমিশনের আইটি বিভাগ ‘বিশেষ ক্ষমতাসীনদের’ দ্বারা নির্দেশিত হয়ে এলগরিদমে পরিবর্তন আনবে না এই নিশ্চয়তা আছে কি? আমরা তো দিনের ভোট রাতে দেখার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নাগরিক!

ইভিএমের সফটওয়্যার আর্কিটেকচার, অপারেটিং সিস্টেম এবং এলগোরিদম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইভিএমে ব্যবহৃত সফটওয়্যারের ওপর নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করে, তাই এই অংশের নিয়ন্ত্রণ যার হাতে থাকবে তার পক্ষে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করা কঠিক কাজ নয়।

অন্যদিকে অডিট কার্ডের মাধ্যমে কেন্দ্রের বুথ থেকে ফলাফল হস্তান্তরের পরে ঐ কেন্দ্রের ফলাফল এবং পুরো আসনের সব কেন্দ্রের ফলাফল দুটাই ম্যানুয়াল প্রসেসের। এখানে অডিট কার্ডের চিপের মাধ্যমেও জালিয়াতি সম্ভব। আর পুরো ইভিএম ভোট প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হলেও শুধু ফলাফল তৈরির ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা করে ভোটের ফলাফল পাল্টে দেয়া সম্ভব। আগে ঢাকা সিটি এবং সম্প্রতি কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে অভিযোগ থাকা স্বত্বে নির্বাচন কমিশন এখনও পর্যন্ত ফলাফল তৈরি ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ার জালিয়তি হয়নি, এটা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি।

বাংলাদেশের ইভিএম কেন ঠিক সকাল আটটায় সুইচ অন করে সিংক করা লাগে, পূর্বের সিংক করা ইভিএম কেন কাজ করে না তার কারিগরি ব্যাখ্যা নেই। ইভিএমে ভিন্ন ভিন্ন অপারেটিং এলগোরিদম মুড আছে কিনা তাও অজানা। চারটা থেকে পাঁচটায় মেশিন ভোট নেয়া বন্ধ করে, মাঝখানে কারিগরি ত্রুটি, যন্ত্র হ্যাং করলে, স্থানীয় কোনো সমস্যা হলে, বিদ্যুৎ চলে গেলে লাইনে অপেক্ষমাণ ভোটার ভোট না দিয়েই কেন ফিরে যাবেন এসবের সদুত্তর নেই।

ছয়. ইভিএমে ভোটার ভেরিফাইড পেপার অডিট ট্রেইল নেই!

বাংলাদেশে ব্যবহৃত ইভিএমের একটি বড় দুর্বলতা হলো, ভোটার ভেরিফাইড পেপার অডিট ট্রেইলের (ভিভিপিএটি) ব্যাকআপ নেই। যেটা ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেখানকার ইভিএমে সংযুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি/ভোটার কাকে ভোট দিলেন সেটার প্রমাণ ব্যক্তি তার কাছে সংরক্ষণ করতে পারেন। ফলে ভোটের শেষে ভোটের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ভোট পুনর্গণনা করা যায়। **কিন্তু বাংলাদেশের ইভিএমে ভিভিপিএটি না থাকায় কমিশন ভোটের যে ফলাফল ঘোষণা করবে তা-ই চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং এটি পুনঃগণনা বা অডিট করার সুযোগ থাকবে না। এ কারণেই কমিশন কর্তৃক গঠিত কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান জামিলুর রেজা চৌধুরী ২০১৮ সালে ইভিএম কেনার সুপারিশে স্বাক্ষর করেননি।**

বাংলাদেশে বিগত ঢাকা ও কুমিল্লা নির্বাচনে যে নতুন ইভিএম ব্যবহার করা হয়েছে তাতে, বিরোধী পক্ষের ভোট জালিয়াতির অভিযোগ আমলেই নেয়া হয়নি। ফলে সেসব নির্বাচনে আদৌ জালিয়াতি হয়েছে কিনা তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

সাত. ডিজিটাল অডিট ট্রেইলের ব্যবস্থা নিরাপদ নয়

বাংলাদেশে যে ইভিএম ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে ডিজিটাল অডিট ট্রেইলের ব্যবস্থা আছে, যদিও যে কোনো ডিজিটাল অডিট ট্রেইলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বিঘ্নিত হবার ঝুঁকি আছে। তবে ব্যবস্থাটি যেহেতু সফটওয়্যারচালিত, তাই সোর্স কোড সংক্রান্ত সমস্যাটি এখানে থেকেই যাচ্ছে। নির্বাচনের ঠিক পুর্বে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দিয়ে প্রতিটি ইভিএম মাদারবোর্ড পরীক্ষা করা, পরীক্ষা শেষে প্রত্যেক সফটওয়্যারের ডিজিটাল ছাপ (ডিজিটাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট) সংরক্ষণ করা দুরূহ কাজ, বলতে গেলে অসম্ভব। সবগুলো যন্ত্রের (প্রায় ৪০ হাজার ভোটকেন্দ্র এবং লক্ষাধিক ইভিএম) হার্ডওয়্যারের লিস্ট, সার্কিট ডিজাইন, হার্ড ডিস্কের ফরেনসিক কপি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল, পক্ষ ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের দেয়া হচ্ছে না এবং তাদের সেসব যাচাইয়ের কারিগরি সক্ষমতাও নেই (*দ্য ডেইলি স্টার*, ২৮ মে ২০২২)।

পেপার ব্যাকের বদলে DREs (ডাইরেক্ট রেকর্ডিং ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) এর সমস্যা হচ্ছে, এর মাধ্যমে ব্যক্তির/ভোটারের ভোট প্রদানের যে কোনো রেকর্ড ভবিষ্যতে বের করে ফেলার ঝুঁকি রয়েছে। বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ পদায়ন ও প্রমোশান দলীয় বিবেচনায় হয় বলে, অতীত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কিংবা সংশ্লিষ্টতা বের করতে সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থা সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। ফলে এধরনের ডিজিটাল রেকর্ড গোপনীয়তার ঝুঁকি তৈরি করে। ভোটারের গোপনীয়তা এবং ব্যালটের গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য সতর্ক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ নকশাই যথেষ্ট নয়, বরং

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষা আইন বা জিডিপিয়ার-এর আদলে বাংলাদেশে জনগণের গোপনীয়তা সুরক্ষা আইন নেই বলে, ডিজিটাল অডিট ট্রেইল ঝুকিপূর্ণ। ২৪ জুলাই ২০২২ পটুয়াখালীতে এক সরকারদলীয় নেতা বলেছেন **'ভোট হবে ইভিএমে, কে কোথায় ভোট দেবে তা কিন্তু আমাদের কাছে চলে আসবে'। এরকম বক্তব্য আমরা চট্রগ্রামেও শুনেছি।**

নির্বাচন কমিশনের একটি অংশের সাথে কোনো জালিয়াত পক্ষের সংযোগ থাকলে এসব জটিল কারিগরি যাচাই-বাছাই আরও কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতিটি ইভিএম সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার একই ভার্সনে তৈরি করাও অসম্ভব, এতে বিশাল খরচের প্রশ্ন জড়িত। প্রযুক্তিবিদ সাইফুর রহমানের মতে, সিস্টেমকে সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম মনিটরিং সফটওয়্যার গুরুত্বপূর্ণ। ভোট চলাকালীন অবস্থায় কেন্দ্রের কেউ ইভিএমের সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার পরিবর্তন করেন বা অসদুদ্দেশ্যে কোনো প্রোগ্রামিং স্ক্রিপ্ট প্রবেশ করান, তাহলে তা সংকেত এবং এসএমএস দিয়ে সব পক্ষকে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোট বন্ধ করার ব্যবস্থা বাংলাদেশের ইভিএমে নেই।

নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মো. আব্দুল আলীম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ইভিএম নিরাপত্তার ওপর আস্থা ফেরাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আইসিটি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা, সফ্টওয়্যার অডিট, বায়োমেট্রিক সিস্টেমের অডিট, ভোটিং মেশিন উত্পাদনের প্রক্রিয়া অডিট এবং ট্যাবুলেশন সফ্টওয়্যার অডিট-সহ বিভিন্ন পাবলিক সিকিউরিটি পরীক্ষার আয়োজন করা দরকার। প্রোগ্রামিং সোর্স কোডটিও খুলতে হবে যাতে যে কেউ অ্যাক্সেস পেতে পারে, অর্থাৎ মেশিনকে ওপেন সোর্স করতে হবে। EVM-এর সাথে VVPAT প্রবর্তন করতে হবে, যা নিশ্চিত করবে যে ভোটাররা তাদের ভোট সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে তা নিজেরাই যাচাই করতে পারবে। এবং অবশেষে, নির্দিষ্ট একটা শতাংশ হারে প্রদত্ত ভোটের ওপর বাধ্যতামূলক VVPAT স্লিপ-ভিত্তিক অডিট চালু করা দরকার (*দ্য ডেইলি স্টার*, ২৬ জুন ২০২২)।

আট. ইভিএম হ্যাং করে

মাঠ পর্যায়ের প্রিজাইডিং অফিসারদের তথ্যমতে, বর্তমান ইভিএমের একটা বড় ত্রুটি হচ্ছে মেশিন হ্যাং হওয়া। ব্যক্তি ভোট পরিবর্তন করতে, অল্প সময়ের মধ্যে একাধিক ব্যালটে চাপ, দ্রুত একাধিক বাটনে চাপ দিলেই মেশিন টা হ্যাং করে যায়। একবার মেশিন হ্যাং করলেই ৫ থেকে ১০ মিনিট নষ্ট হয়, মেশিন পুনরায় সিনক্রোনাইজেশান বা রিস্টার্ট দিতে হয়। এতে ভোট গ্রহণের হার কমে যায়।

নয়. ইন্টিগ্রেটেড রেজাল্ট তৈরির সুযোগ নেই, ভোটদান ডিজিটাল কিন্তু ফলাফল তৈরি ম্যানুয়াল কেন?

একটি নির্বাচনী আসনের সব কেন্দ্রের মোট ফলাফল হাতে তৈরি করা হয়। কিছু কেন্দ্রের ফলাফল ইভিএমে এবং কিছু কেন্দ্রের ফলাফল হাতে করে একটা অস্বচ্ছ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। সব কেন্দ্রের ফলাফল ম্যানুয়ালি নিয়ে, ম্যানুয়ালি কেন্দ্রের ফলাফল তৈরির পদ্ধতি একদিকে হাস্যকর এবং অন্যদিকে জালিয়াতপ্রবণ। সবকেন্দ্রের ইন্টিগ্রেটেড ফলাফল তৈরি করতে বর্তমান ইভিএম সক্ষম নয়।

পোলিং কার্ডের 'ভোট প্রদানের তথ্য' অডিট কার্ডে এনে ফলাফল তৈরি করতে হয়। কিন্তু মাস্টার ডেটাবেইজ নেই বলে এসব ডেটাবেইজ ট্রান্সফার করে ম্যানুয়ালি যোগ করার জঞ্জাল আছে, ফলে এখানে অস্বচ্ছতা তৈরি সম্ভব। ডিজিটাল ভোটের নামে চালানো হলেও বাংলাদেশের ইভিএম যান্ত্রিক উৎকর্ষের দিক থেকে জঞ্জালপূর্ণ। একটি ভোট কেন্দ্রের সব বুথের মোট ফলাফল এবং একটি নির্বাচনী আসনের সব কেন্দ্রের চূড়ান্ত ফলাফল তৈরির পদ্ধতিটি ডিজিটাল বা স্বয়ংক্রিয় নয়, বরং ম্যানুয়াল। এটি ইভিএমের অন্যতম বড় সীমাবদ্ধতা। ***ইভিএমের অপরাপর সব প্রক্রিয়া ডিজিটালি স্বচ্ছ হলেও শুধু ফলাফল তৈরির ম্যানুয়াল কাজটি অস্বচ্ছ করা যেতে পারে। অডিট কার্ডের মাধ্যমে বুথ ফলাফল হস্তান্তরের পরে ম্যানুয়াল ফলাফল তৈরির কাজ সমুদয় ইভিএম ব্যবস্থাকে শঙ্কার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।***

ইভিএমের মাধ্যমে নির্বাচন: কমিশনের সক্ষমতা কতটুকু?

২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছয়টি আসনে ইভিএম ব্যবহার করা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন অনুমানিক ২০০৮ সাল থেকে ইভিএম নিয়ে কাজ করছে। দেড় দশকে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচের পর বর্তমানে নির্বাচন কমিশন তাদের 'ইভিএম ভোট করার' কারিগরি সক্ষমতাকে ৬ থেকে ৭৫টিকে উন্নীত করেছেন। এরমধ্যে একাদশ নির্বাচনের আগে ইভিএম ক্রয়ে ব্যয় হয় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা (৪৫০ মিলিয়ন ডলার)। প্রশ্ন হচ্ছে, ১৪ বছরে যেখানে ইসি ৭৫টি কেন্দ্রে ভোট করার কারিগরি সক্ষমতা তৈরি করেছে সেখানে মাত্র এক বছরেই এই সক্ষমতা দ্বিগুণ করতে পারবে কি? ইভিএম ভোট তো শুধু বিদেশ থেকে ইভিএম যন্ত্র কেনার বিষয় নয়, বরং এখানে দক্ষ টেকনেশিয়ান, ইভিএম রক্ষণাবেক্ষণ, নির্বাচন পরিচালনার কারিগরি প্রশিক্ষণের বিশদ কর্মযজ্ঞের বিষয় আছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে বেশ কিছু নষ্ট মেশিন সরবরাহ করা হয়েছিল, এসব মেশিন রিপ্লেইস করা সময়সাপেক্ষ বলে নির্বাচনের ভোটদানের হার ধীর হয়েছে এবং কমেছেও।

নির্বাচন কমিশনের কারিগরিভাবে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবলের অভাবে সব কেন্দ্রে এমনকি ডেমো ভোটিংও সম্ভব হয় না। ফলে অধিকাংশ ভোটার ভোটকেন্দ্রে এসে বিব্রত হয় এবং বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। এর ফলে সাহায্যের নাম করে দলীয় লোকেরা গোপন বুথে ঢুকার সুযোগ পায়।

কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা ও ট্যাব সরবারহ করা হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ আছে যে চারটি কেন্দ্রের ফলাফল দেরিতে এসেছিল, কাকতালীয়ভাবে সেখানে সিসি ক্যামেরা অচল ছিল।

আরও কয়েকটি বিষয়

ক. ভোট গ্রহণে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেন নির্বাচন কমিশনের নন টেকনিক্যাল কর্মকর্তারা। এসব প্রশিক্ষণে শুধু মেশিন অন-অফ করা, ভোট দেওয়ার জন্য বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণ ও ভোটের ডিজিটাল বাটন টিপা শিখানো হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রিইজিডিং অফিসার কোনো কারিগরি সমস্যার সমাধান করতে পারেন না।

খ. টেকনিশিয়ানের অভাব। একটি কেন্দ্রের ৬, ৮ বা ১০টি বুথের জন্য নয়, বরং কাছাকাছি অবস্থিত দু বা তিনটি কেন্দ্রের প্রায় ২০টির বেশি বুথের জন্য মাত্র একজন টেকনিশিয়ান দেওয়া হয়। একইসঙ্গে একাধিক মেশিন হ্যাং করলে টেকনিশিয়ানের কিছুই করার থাকে না।

গ. ইভিএমে ভোট দানের সময়, অপরাপর ডিজিটাল জরিপ বা পোলিং-এর মত প্রদত্ত ভোটের ফলাফলের তাৎক্ষণিক হিসাব দেখানো হয় না বলে। ফলে ভোটার চূড়ান্ত ফলাফলের বিষয়ে নির্ভার থাকতে পারেন না। যে কোনো ডিজিটাল ভোটিং সিস্টেম ভোটারকে 'ভোট দানের ঐ সময় পর্যন্ত' তাৎক্ষণিক ফলাফল দেখাতে সক্ষম হবার কথা। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দুই বার ভোট গণনা করতে হয়েছিল।

ঘ. একটা ইভিএম ৮-১২ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন চার্জ দেওয়া হলে সেটি সর্বোচ্চ ৫-৬ ঘন্টা সার্ভিস দিতে পারে। জ্বালানি সংকটের কারণে বর্তমানে দেশে লোডশেডিং চলছে। তাই ইভিএম ভোট বিঘ্নিত করার কারণ হতে পারে।

অর্থনৈতিক সংকটকালে ইভিএমের অতি উচ্চ খরচ যৌক্তিক কি?

বাংলাদেশের কেনা লক্ষাধিক ইভিএমের প্রতিটির মূল্য দুই লক্ষাধিক টাকা, বিপরীতে ভারতে একটি ইভিএম-এর দাম বর্তমানে মাত্র ১৭ হাজার রুপি। ৮ নভেম্বর, ২০১৮ প্রথম আলো প্রতিবেদন করেছে যে, '**ভারতের চেয়ে ১১ গুণ বেশি দামে ইভিএম**'। তার সাথে আছে ৬৪ জেলায় ইভিএম রাখার গোডাউন ভাড়ার খরচ, কারিগরি পরিচালনা, ট্রান্সপোর্ট ফি, রক্ষণাবেক্ষণ ফি, এক্সপার্ট ও কনসালটেন্সি ফি। খরচের আরেকটা বড় অংশ হচ্ছে প্রশিক্ষণ ফি, কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা, আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা ফি। আছে ট্যাব ক্রয়, সিসিটিভি ক্রয়ের খরচ। সারাদেশের চার লক্ষাধিক নির্বাচনী কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা ও ট্যাব প্রদান খরচের দিক থেকে অসম্ভব। বর্তমান ডলার সংকটের সময় ইভিএম আমদানির ব্যয় আরও বেশি অসম্ভব! বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকটে ইভিএম সক্ষমতা দ্বিগুণ করতে গেলে, নতুন করে একটা 'ডলার ড্রেইন'-এর পথ তৈরি হবে। সবমিলে বর্তমান ৭০-৭৫ আসনের ইভিএম যন্ত্র, স্টোরেজ, পরিবহণ, যোগাযোগ, ট্রেনিং, নিরাপত্তা, সবধরণের ভৌত ও কারিগরি রক্ষণবেক্ষণে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এমতাবস্থায় বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট ও সরকার ঘোষিত কৃচ্ছতা পলিসির বাইরে এসে অনুরূপ আরও চার-পাঁচ হাজার কোটি টাকা খরচের যৌক্তিকতা ঠিক কোথায়?

এত খরচের পরেও কারচুপিহীন সুষ্ঠু নির্বাচন ইভিএমের ওপর নয় বরং যারা নির্বাচন পরিচালনা করবেন যেমন প্রশাসনের কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশনার কিংবা রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের জনগণের অবিশ্বাস জেগেছে যে, মূলত ক্ষমতাসীন দলই নির্বাচন পরিচালনা করে, নির্বাচন কমিশন তাদের আজ্ঞাবহ! তাই ইভিএমের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন এবং ভোট ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থাটা আছে কিনা, এই বিষয়টি।

ইভিএমে মানুষের আস্থা আছে কি?

নতুন ভোটদান পদ্ধতি বলে যন্ত্রটির প্রতি অনেক মানুষের খুব উৎসাহ কাজ করে, তথাপি ভোটাধিকার হরণের দুর্বৃত্তপনা ক্রমাগত চলমান বলে ভোট ব্যবস্থার ওপর জনগণের অনাস্থা চরমে পৌঁছেছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ২৯ শতাংশ, উত্তরে ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ। ইভিএম ভোটকেন্দ্রে ভোটদানের অতি নিম্নহার এমনই হতাশাজনক ছিল যে, এমনকি নির্বাচন কমিশনও তা লুকাতে পারেনি।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত আলোচিত শিল্পী সমিতির নির্বাচনে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। কিন্তু ইভিএমের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি মিশা-জায়েদ ও ইলিয়াস কাঞ্চন-নিপুণ পরিষদ। তাদের মতে, এটিতে নাকি ভোট চুরি হয় (*যুগান্তর,* ৩০ জানুয়ারি ২০২২)।

ক্ষমতাসীন দল এবং নির্বাচন কমিশন ইভিএম নিয়ে অতি উৎসাহী হলেও অনলাইন ভোট কিংবা ভোটকেন্দ্রে সিসি-টিভি ক্যামেরার বাধ্যবাধকতা বিষয়ে একেবারেই নির্বিকার। নতুন সমস্যা সবকেন্দ্রে ইভিএমে ভোট করার সরকারদলীয় চাপ।

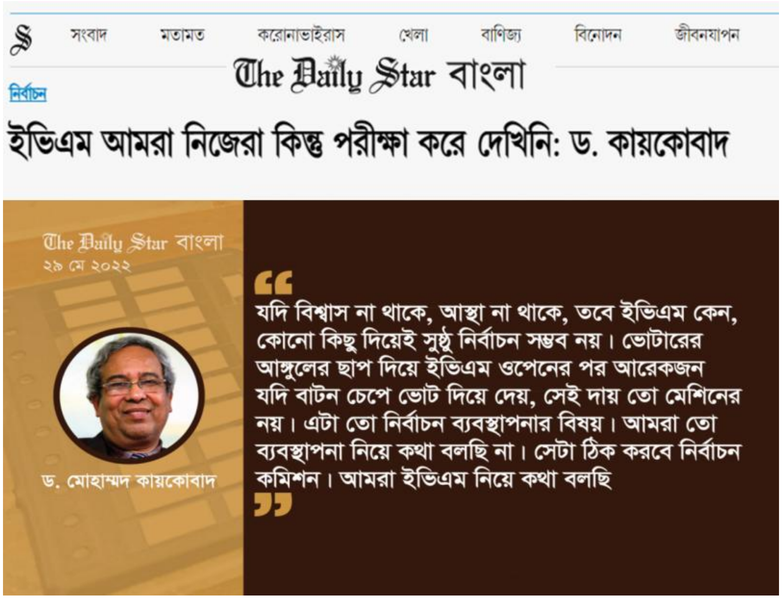

সবচেয়ে বড় কথা, ইভিএম হচ্ছে একটা যন্ত্র, আমরা এই যন্ত্রকে যে নির্দেশ দেব সেই কমান্ড অনুযায়ী এটি কাজ করবে। ইভিএমের কমান্ডে থাকবে আমাদের নির্বাচন কমিশন। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতাই তো শূন্যের কোঠায়।

বর্তমানের যে ইভিএম এটা ২০১৩ সালের আগের বুয়েটের ডিজাইন করা ইভিএম নয়। বরং নতুন ইভিএমের হার্ডওয়্যার বিদেশি। অধ্যাপক ড. কায়কোবাদ ডেইলি স্টারকে বলেছেন, ***'ইভিএম আমরা নিজেরা কিন্তু পরীক্ষা করে দেখিনি'।***

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অচলাবস্থা এবং ভোট ব্যবস্থার সংকটটি শতভাগ রাজনৈতিক। ১৫০ আসনে ইভিএম নির্বাচন হবে, এমন ঘোষণার প্রেক্ষিতে জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান ও সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা জি এম কাদের অভিযোগ করেছেন, **'কারচুপি করতেই ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোট গ্রহণ করতে চাচ্ছে ক্ষমতাসীনেরা। দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। নির্বাচনের ওপর সাধারণ মানুষের কোনো আস্থা নেই। এখন সব ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে'** (প্রথম আলো, ২৩ আগস্ট ২০২২)।

বিগত ২০২০ সালের ঢাকা উত্তর সিটি নির্বাচনের পরে একজন পরাজিত মেয়র প্রার্থী ইভিএম ভোটে কারচুপির অভিযোগ এনে ফলাফল বাতিল করার জন্য নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে যে আবেদন করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত সংশ্লিষ্টদের তলব করে নথি সরবরাহ করতে বলেন। (নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের কাছে ১৪ নথি চেয়েছেন ..., ২৯ জুলাই ২০২০, যুগান্তর)। তথাপি ইভিএম সম্পর্কিত সব রেকর্ড, সিল, পোলিং কার্ড, অডিট কার্ড এবং এসডি কার্ডের রেকর্ডিং, লগ বই, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্তদের তথ্য নির্বাচন কমিশন চাহিদামত সরবরাহ করেনি। ফলে ইভিএম ভোটে কারচুপির অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করা যায়নি। ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচন কিংবা অপরাপর ভোট কারচুপির অভিযোগগুলোও কমিশন আমলে নেয়নি, গুরুতর সব অভিযোগের বিষয়ে নিজেরা স্বপ্রণোদিত কোনো উদ্যোগও নেয়নি।

অতীতে রাজনৈতিক সংকটের আদালতি কিংবা আমলাতান্ত্রিক সমাধান যেমন কাজে আসেনি, ঠিক তেমনি ভবিষ্যতেও রাজনৈতিক সংকটের কারিগরি সমাধান কোনো কাজে আসবে কি? আমরা মনে করি, রাজনৈতিক সংকটের রাজনৈতিক সমাধানই কাম্য। রাজনৈতিক সংকটের রাজনৈতিক সমাধানই টেকসই, এবং দীর্ঘমেয়াদে তা দেশ ও দশের জন্য মঙ্গলজনক।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, প্রযুক্তিবিদ, টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক লেখক, তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক কৌশল, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, সিনিয়র সফটওয়্যার সল্যুশান অর্কিটেক্ট, ভোডাফোন জিজ্ঞো নেদারল্যান্ডস।

নিবন্ধটি ২৮ আগস্ট ২০২২, জাতীয় প্রেসক্লাবে, 'সুজন—সুশাসনের জন্য নাগরিক' কর্তৃক আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত।